ATMADEEP

An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal

ISSN: 2454–1508

Impact Factor: 4.5

Volume- I, Issue-VI, July, 2025, Page No. 1321-1326

Published by Scholar Publications, Sribhumi, Assam, India, 788711

বিমল করের গোয়েন্দা কাহিনির ভিলেন চরিত্রে বৈচিত্র: একটি বিশ্লেষণাত্মক অধ্যয়ন

চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, *গবেষক, বাংলা বিভাগ, গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়, অসম, ভারত*

ড. জাহ্নবী দাশ, *সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, লামডিং কলেজ, অসম, ভারত*

Received: 18.07.2025; Accepted: 22.07.2025; Available online: 31.07.2025

©2025 The Author(s). Published by Scholar Publications. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

The Bengali literature is full of various literary forms. Among them, detective literature is a very popular branch. Readers of all ages are attracted to this type of story. Because such a story begins with a problem and the source of that problem is searched for throughout the story and the solution is described at the end. The person at the root of this problem is the villain or enemy or criminal. In detective stories, the character of this enemy or criminal can be seen in variety. Criminals use their intelligence to cover up their misdeeds and create such a situation that even the detective often has trouble catching them. Such a variety of villain characters can be seen in the story of Bimal Kar's Kikira character. His villains or criminals think of their own gain by cheating people through banquets, tantra and mantras. Our research paper has been named, 'Variations in the Chacracter Sketch of Villains in Bimal Kar's Detective Stories: An Analytical Study'. The main research paper will show the different portrayals of villain characters based on a novel by Kikira.

Keywords: Villain, Intelligence, Variety in Criminal Character, Tantra

গোয়েন্দা কাহিনি বা রহস্য কাহিনি সাহিত্যের বিভিন্ন বিচিত্র শাখার মধ্যে একটি বিশিষ্ট শাখা। শুধুমাত্র এদেশেই নয়, বিদেশেও এই কাহিনির জনপ্রিয়তা রয়েছে। যার ফলে এই শ্রেণির কাহিনির প্রতি শিশু থেকে শুরু করে বয়োজ্যেষ্ঠ পাঠকের সমান কৌতুহল লক্ষিত হয়। আমাদের ভারতীয় সাহিত্যে গোয়েন্দাকাহিনির প্রতিফলন দেখা গেছে ঊনবিংশ শতাব্দীতে, কিন্তু এর বীজ প্রাচীন যুগের সাহিত্যেও লুকিয়ে ছিল। এই সম্পর্কে অধ্যাপক সেন, তাঁর ক্রাইম কাহিনির কালক্রান্তি বইতে আলোচনা করেছেন। সেখানে তিনি বলেছেন, বৈদিক ভাষা এবং ইন্দোইউরোপীয় মূল ভাষায় স্তায়ু বা তায়ু শব্দ পাওয়া যায়, যার সঙ্গে, যা চোর বা চুরি জাতীয় শব্দের সঙ্গে সম্বন্ধিত। কারণ সে সময়ের সমাজে কুকর্ম বা খারাপ কাজ হিসেবে একমাত্র চুরিই প্রচলিত ছিল। এছাড়াও দুষমনস ও কিতব নামে দুটি শব্দ পাওয়া গেছে, প্রাচীন পারসিক ও সংস্কৃত আবেস্তায়। এই গোয়েন্দা কাহিনির উৎপত্তির মূলে রয়েছে যে অপরাধের ঘটনা অর্থাৎ দুষ্কর্ম তার কাণ্ডারী হচ্ছে ভিলেন। এই ভিলেন বা খলনায়কেরা গোয়েন্দা সাহিত্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে রয়েছে। কারণ তারা অপরাধ ঘটাচ্ছে বলেই গোয়েন্দার প্রয়োজন হচ্ছে তদন্ত করার জন্য। বিশেষত গোয়েন্দা চরিত্রে যতটা বৈচিত্র দেখা গেছে, তার চেয়ে ভিলেন চরিত্র অধিক বৈচিত্রময় হয়েছে। গোয়েন্দা সাহিত্যে ভিলেন বা দুশমন চরিত্ররা নিজ-নিজ বুদ্ধি ও বিচিত্র কাণ্ডকারখানার মাধ্যমে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। এই প্রতিনায়ক বা ভিলেন চরিত্রের ভিন্নতার জন্যই গোয়েন্দা কাহিনি গতানুগতিক না হয়ে আকর্ষণীয় হয়েছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে গোয়েন্দা সাহিত্যের উৎকর্ষের মূলে গোয়েন্দা বা ডিটেকটিভ সহ ভিলেন চরিত্রেরও গুরুত্ব রয়েছে।

বিশ্বসাহিত্যের প্রাঙ্গণে অন্যান্য সাহিত্যের পাশাপাশি গোয়েন্দা সাহিত্যেরও জনপ্রিয়তা রয়েছে। এই সাহিত্যে মূল উপজীব্য বিষয় হচ্ছে রহস্য উন্মোচন। এই রহস্য উদঘাটনে মুখ্য ভূমিকায় দেখা যায় গোয়েন্দাকে, কিন্তু যার জন্য কাহিনি রহস্যময় হয়ে উঠেছে, তিনি হলেন ভিলেন বা প্রতিনায়ক। এই শ্রেণির সাহিত্যে ডিটেকটিভ ও ভিলেন দুজনের মধ্যে বুদ্ধির প্রতিযোগিতা চলে। বুদ্ধির বলে একদিকে গোয়েন্দা যেমন রহস্য উন্মোচনের চেষ্টা করেন, অন্যদিকে প্রতিনায়ক বা ভিলেন গোয়েন্দাকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেন, যার ফলে গোয়েন্দা সাহিত্য উপভোগ্য হয়ে উঠে। এই ভিলেন চরিত্র রচনায় লেখকেরা বৈচিত্রের প্রতিফলন ঘটিয়েছেন। বর্তমান গবেষণাপত্রে বিমল করের কিকিরা কাহিনির খলনায়ক বৈচিত্র সম্পর্কে আলোকপাত করা হবে।

গোয়েন্দা সাহিত্যের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দুতে গোয়েন্দার পাশাপাশি ভিলেন চরিত্রেরও সমান গুরুত্ব রয়েছে। ভিলেনরা যথেষ্ট বুদ্ধিদীপ্ত ও ক্ষুরধার চিন্তাধারার অধিকারী হয়। অপরাধের ঘটনাটিকে তারা এমনভাবে সাজায়, যে অনেক সময় গোয়েন্দাকেও টের পেতে বেগ পেতে হয়। এই দুশমন বা ভিলেন শব্দের উৎসমূল সম্পর্কে জানা যায় অধ্যাপক সুকুমার সেনের রচনায়। তাঁর মতে সে সময়ের সমাজে ক্রাইম বলতে চুরিই প্রচলিত ছিল। তাছাড়া বৈদিক ভাষা এবং ইন্দোয়ুরোপীয় ভাষায়ও তায়ু বা স্তায়ু শব্দটিও পাওয়া যায়, অধ্যাপক সেনের মতে এই শব্দ চুরির সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত। তিনি আরো জানাচ্ছেন যে প্রাচীন পারসিক ভাষায় দুশমষ শব্দে মন্দবুদ্ধি, বা বদমাইশ বোঝোনো হত, এই শব্দটি ফারসি ভাষায় দুশমন হয়ে ভারতীয় ভাষায় এসেছে। প্রতিনায়ক চরিত্র সৃষ্টি করতে লেখককে যথেষ্ট সচেতন হতে হয়। কারণ দুটি গল্পের গোয়েন্দা চরিত্র অনেকটা একরকম হতেই পারে, কিন্তু প্রতিনায়ক বা ভিলেন চরিত্র অবশ্যই আলাদা হতে হবে। সেজন্য লেখককে কাহিনি, বিষয়বস্তু এবং পটভূমির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে প্রতিনায়ক চরিত্রসৃষ্টি করতে হয়। অনেক গোয়েন্দা চরিত্রের আদলের উপরও প্রতিনায়ক বা ভিলেন চরিত্রের গঠন নির্ভর করে। এ সম্পর্কে প্রসেনজিৎ দাশগুপ্ত জানাচ্ছেন,

> "হুমায়ুন আহমেদের বহু উপন্যাসের প্রধান চরিত্র মিশির আলি মানুষের মনের আলো আঁধারের দিকটি ভালো বুঝতেন। ফলে তার কাছে এমন সব মামলা আসে যেগুলি আপাতদৃষ্টিতে অবোধ্য, অলৌকিক বা বুদ্ধিতে যার ব্যাখ্যা চলেনা বা এই ধরণের। মিশির আলি খুঁজে বার করতেন এই রহস্যগুলির কারণ এবং কীভাবে দুর্জনরা এগুলি ব্যবহার করে অন্যদের ভয় দেখাত, বা মারার চেষ্টা করত, বা অন্য অপরাধ ঘটাতো। অতএব, মিশির আলির গল্পের ভিলেনদেরও এই ধরণের কার্যকলাপে অভিজ্ঞ হতে হত।"[১]

সাহিত্যে প্রতিফলিত প্রতিনায়ক চরিত্রগুলোকে সাধারণভাবে দুটি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। যেমন - ক) যে সমস্ত প্রতিনায়করা, একের পর এক কাহিনিতে ফিরে-ফিরে এসেছে, খ) যেসব অপরাধীরা ধরা পড়েছে বা পালিয়ে যাওয়ার পর তাকে আর ধরা যায়নি। তবে এই চরিত্ররা আর কোনো কাহিনিতে ফিরে আসেনি। এই দুটি বিভাগের উদাহরণ সম্পর্কে প্রসেনজিৎ দাশগুপ্ত শ্রীস্বপনকুমার সৃষ্ট গোয়েন্দা দীপক চ্যাটার্জীর কাহিনির কথা বলেছেন, যেমন- ড্র্যাগন, কালনাগিনী ইত্যাদি। আবার বার-বার ফিরে আসা প্রতিনায়কদের মধ্যে ফেলুদাকাহিনির মগনলাল মেঘরাজের নাম উল্লেখযোগ্য। প্রতিনায়কদের বুদ্ধি যে অনেক সময় গোয়েন্দাকেও প্যাঁচে ফেলে দেয় তার প্রমাণ পাওয়া যায়, ফেলুদা গল্পের কথক তোপসের একটি উক্তির মধ্যে-

> "বাড়িতে বসে আমি আর ফেলুদা অনেক সময় আমাদের পুরনো অ্যাডভেঞ্চারগুলো সম্বন্ধে আলোচনা করেছি, বিশেষ করে তাদের সম্বন্ধে যাদের শয়তানি বুদ্ধি ফেলুদাকেও মাঝে মাঝে প্যাঁচে ফেলে দিয়েছিল।"[২]

প্রতিনায়ক বা অপরাধীদের অপরাধ ঘটানোর মূলে রয়েছে প্রাচীন দার্শনিকদের উল্লেখিত ষড়রিপু- কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ এবং মাৎসর্য। পাশ্চাত্যের ভিদক থেকে শুরু করে, আমাদের দেশের বাঁকাউল্লা পর্যন্ত সমস্ত গোয়েন্দাকাহিনির ভিত্তি মূলে রয়েছে এই ছয় রিপু। নদীর স্রোতের মত সমাজ ও যুগের পরিবর্তন ঘটেছে, সেই সঙ্গে মানুষের চরিত্র ও পরিস্থিতির বদল ঘটেছে। কিন্তু গোয়েন্দা সাহিত্যের এই ধারার ভিত্তি সৃষ্টি হয়েছে এই ছটি রিপুকে অবলম্বন করে। এক একজন অপরাধীর কুকর্মের ধরণ যেমন ভিন্ন, তেমনি তাদের ব্যবহার ও চালচলনও ভিন্ন। কোনো গল্পে দেখা যায় খলনায়ক একজন সাধারণ, নিপাট ভালোমানুষ, কিন্তু বুদ্ধিবলে অপকর্ম করে ভিলেনে পরিণত হয়েছে। ভিলেন সম্বন্ধে ফেলুদাকাহিনির কথক বলেছে-"পালিশ করা ভিলেন।"[৩] উদাহরণ হিসেবে

'গোরস্থানে সাবধান' এর মহাদেব চৌধুরীর কথা উল্লেখ করা যায়। অপরাধীদের দুষ্কর্ম করার অনেক কারণ লক্ষ্য করা যায়, তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে লোভ ও ক্রোধ। যার ফলে কোনো কিছু চিন্তা না করে কুকর্ম করে ফেলার পর অপরাধীরা কীভাবে নিজেকে রক্ষা করবে সে চিন্তায় ব্যস্ত হয় এবং অন্যের উপর দোষ চাপিয়ে দেয় ধূর্ততার সঙ্গে। এধরণের প্রতিনায়ক চরিত্র দেখতে পাওয়া যায় শরদিন্দুর 'আদিমরিপু' উপন্যাসে। সমরেশ বসুর রচনায়ও এধরণের চরিত্রের দেখা পাওয়া যায়, যাদের কোনোমতেই দোষী বলে মনে হয়না , কিন্তু শেষে দেখা যায় সেই প্রকৃত অপরাধী। সত্যজিৎ এর ফেলুদাকাহিনির প্রতিনায়কদের মধ্যেও বৈচিত্রের প্রতিফলন দেখা যায়। এদের মধ্যে কেউ সংগ্রাহক, কেউ অভিনেতা যশপ্রার্থী, কেউ আবার পেশাদার শিল্পকীর্তিচোর, কেউবা সাধারণলোভী, কয়েকজন আবার প্রতিহিংসাপরায়ণ। এসম্পর্কে প্রসেনজিৎ দাশগুপ্ত বলেছেন-

> "ফেলুর অ্যাডভেঞ্চারের খলনায়কেরা মানসিকতার দিক থেকে বেশিরভাগ সময়ে বেশ উঁচুস্তরের। কারণ তারা তাদের অর্থলোভ মেটাতে চেষ্টা করে এমন কিছু চুরি করে যেগুলির মর্ম সাধারণ চোর বুঝবে না।"[৪]

আবার ব্যোমকেশের রচনায় ভিলেন চরিত্রের মধ্যে মানবিক গুণ ফুটে উঠতে দেখা যায়। কোনো কোনো ভিলেনের মানবিক গুণ এতটাই অধিক যে ধরা পড়ার পরও ব্যোমকেশ তাদের ছেড়ে দিয়েছেন বা পুলিশের থেকে বাঁচিয়েছেন। এপ্রসঙ্গে 'রক্তেরদাগ' উপন্যাসের প্রতিনায়ক উষাপতিকে অপরাধী জেনেও গোয়েন্দা ব্যোমকেশ তাকে ছেড়ে দিয়েছিলেন। কারণ ব্যোমকেশ তাকে কথা দিয়েছিলেন। গোয়েন্দা ব্যোমকেশের মতে উষাপতি খলনায়ক হলেও সে ন্যায়ের পথে রয়েছে, সেজন্য তাকে সাধারণভাবে বাঁচার সুযোগ করে দেন তিনি। এই একই ঘটনা লক্ষ্য করা যায় আদিমরিপু উপন্যাসে। সেখানেও খুনিকে ছেড়ে দিয়ে, বাঁচার সুযোগ করে দিয়ে গোয়েন্দা বলেন,

> "নতুন ভারতবর্ষের নতুন মানুষ আপনি, অন্তরে বাহিরে আপনি স্বাধীন।"[৫]

বিমল কর সৃষ্টি গোয়েন্দা কিকিরার কাহিনিতেও খলনায়কেরা একটি বিশিষ্ট স্থান দখল করে রয়েছেন। এঁরা কখনও খুনি, কখনও ঠগবাজ, আবার কখনও তন্ত্রসিদ্ধপুরুষ, কখনোও বা বুদ্ধিদীপ্ত অপরাধী। তাঁরা নানাভাবে মানুষকে ঠকিয়ে নিজের উদ্দেশ্য সাধনের চেষ্টা করেন। আবার কখনও নিজের সাধের জিনিষ আপনজনের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য আত্মগোপন করে থাকেন। 'কৃষ্ণধামকথা' উপন্যাসে এই ধরণের ঘটনা লক্ষ্য করা যায়। উপন্যাসে দেখা যায়, কাপড়ের ব্যবসায়ী হীরালাল বাবু, নিজের বাগানবাড়ি থেকে হঠাৎ উধাও হয়ে যান। কলকাতা শহরে তাঁদের চারটে দোকান ছিল, সবগুলো থেকেই আয় ভালোই হচ্ছিল। সেই হীরালালবাবু শখ করে, জোড়া বটতলারদিকে জমি কিনে কৃষ্ণধাম নামে একটি বাগান বাড়ি বানিয়েছিলেন। প্রতি সপ্তাহের শুক্রবার তিনি বাগানবাড়িতে চলে আসতেন, আবার সোমবারে ফিরে যেতেন। তাঁর সংসারে পুত্রকন্যারা রয়েছে, বাবার ব্যবসা ছেলেরাই দেখাশোনা করে। হীরালালবাবু নিজেকে ধীরে-ধীরে সমস্ত কিছু থেকে দূরে সরিয়ে নিচ্ছিলেন। কোনো ব্যাপারে কোনো মতামত দিচ্ছিলেন না, একেবারে নিস্পৃহ ও উদাসীন। এমন অবস্থায় তাঁকে নিজের শখের বাগানবাড়ি থেকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, তাই ভয় পেয়ে হীরালালবাবুর কর্মচারি যশোদাজীবন কিকিরাকে খবর দেন। এই যশোদাজীবন, হীরালালবাবুর সারাজীবনের সঙ্গী, যৌবনের সময় থেকে তাঁর সঙ্গে ছিলেন, তাই দুঃখের দিনেও যশোদাকে সঙ্গে রেখেছিলেন তিনি। তাই সমাজের কাছে যশোদাবাবুর পরিচয়,

> "লোকে জানে, যশোদা হলেন হীরালালের ম্যানেজার এবং বিশ্বস্ত বান্ধব।"[৬]

যেদিন হীরালালবাবু নিখোঁজ হন, সেদিন তিনি যশোদাকে মাইল চারেক দূরে এক নার্সারিতে পাঠিয়েছিলেন, একটা কাজের অছিলায়। সেখান থেকে ফিরে এসে যশোদাবাবু, আর তাঁর মালিককে দেখতে পাননি। বাড়ির অন্যান্য কর্মচারীরাও কিছু বলতে পারেনি। এরপর হীরাবাবুর ছেলেদের সঙ্গে পরামর্শ করে যশোদাবাবু কিকিরাকে ডাকেন অন্তর্ধান রহস্যের সমাধান করার জন্য। প্রথমে কিকিরা মামলাটি শুনলেন তারপর কৌতূহলে রাজি হয়ে গেলেন এবং ঘটনাস্থল অর্থ্যাৎ কৃষ্ণধামে এসে পৌঁছলেন সঙ্গে এলো তারাপদ, যে হচ্ছে তাঁর সঙ্গী। সমস্ত ঘটনা শুনে, ও সেইসঙ্গে হীরালালবাবুর রেখে যাওয়া চিরকূটগুলো পড়ে কিকিরা কিছুটা আঁচ করতে পেরেছিলেন যে ব্যবসা নিয়ে ছেলেদের সঙ্গে মনমালিন্যের ফলেই অন্তর্ধানের ঘটনা ঘটেছে। যশোদাবাবুকে জিজ্ঞেস করলেও তিনি এড়িয়ে যান। এরপর কৃষ্ণধামের ঘরগুলো ঘুরে দেখার সময় ঠাকুরঘরের পেছনে একটি ঘোরানো লোহার সিঁড়ি দেখে কিকিরার কাছে সবটা স্পষ্ট হয়ে যায়। এর মাঝে কথার ছলে যশোদাবাবু র কাছ থেকে হীরালাল ও তাঁর ছেলেদের

মধ্যে সম্পর্ক কেমন, তাও জেনে নেন তিনি। পরিষ্কার করে সবটা না বললেও বোঝা যায় বড় ছেলের সঙ্গে কিছু ঝামেলা চলছিল। এরপর কিকিরা কৃষ্ণধামে আগুন লাগানোর ছল করে হীরালালবাবুকে সবার সামনে আসতে বাধ্য করেন। তখন তাঁকে প্রশ্ন করলে তিনি জানান, তাঁর বড়ছেলে কানাইলাল, শ্যামবাজারের দোকানটি পুড়িয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা করেছিল, নতুন করে বানাবে বলে, আর কাছে থাকা দর্জির দোকানটিকে কিছু টাকা দিয়ে তুলে দেবে। এটাই তিনি মেনে নিতে পারেন নি, মনের দুঃখে নির্বাসন নিয়েছিলেন। তিনি বলছেন,

> "দরজির দোকানটাকে কিছু টাকা দিয়ে তুলে দেবে।.... বলুন, এ অধর্ম নয় , পাপ নয়, জুয়াচুরি নয়। আমি আমার কাঁধে, মাথায় শাড়ির বোঝা বয়ে জীবন শুরু করেছিলাম। অনেক রক্ত জল করে আমার ওই দোকান। প্রায় চল্লিশ বছরের........! সেই দোকানে আজ ও আগুন লাগাবে!"[৭]

হীরালালবাবুর কাছে দোকানগুলো ছিল প্রাণের চেয়েও প্রিয়, তাই সে দোকানের কোনো ক্ষতি তিনি মেনে নিতে পারেননি, ছেলেদেরও বোঝাতে পারেননি, তাই নিজেই নিজের অন্তর্ধান রহস্য পরিকল্পনা করেন এবং বাড়ি থেকে পালিয়ে যান। কিন্তু কিকিরার বুদ্ধির কাছে হেরে তাঁকে শেষপর্যন্ত ধরা দিতেই হয়, নিজের সাধের কৃষ্ণধামকে পুড়তে তিনি দেখতে পারলেন না, বেরিয়ে এলেন এবং অন্তর্ধান রহস্যের সমাধান হলো।

সোনালী সাপের ছোবল, উপন্যাসে দেখা যায় সোনালী সাপের মাথার উপর থাকা হীরের লোভে দুই-দুইটি খুন করেন ভিলেন জলধরবাবু। উপন্যাসের কাহিনিতে দেখা যায় কলকাতার কদমপুর এলাকার মৃণালকুঞ্জ নামে এক আবাসভবনে তিন-চারমাসের মধ্যে দুটি খুন হয়। সেই আবাসভবনের মালিক হরিচন্দনবাবু এই খুনের কোনো কিনারা খুঁজে পেলেন না, এমনকী ম্যানেজার দীননাথবাবুও ভয়ে পালিয়ে গেলেন, তাঁর মতে মৃণালকুঞ্জে কোনো অশুভশক্তির খেলা চলছে। সেসময় হরিবাবু, তাঁর বন্ধু পানুবাবুর সাহায্য চাইলেন। তখন তিনি কিকিরার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন এবং কিকিরা উক্ত দুটি খুনের রহস্য খুঁজে বার করার জন্য সচেষ্ট হলেন। হরিবাবুর কথায় কিকিরা মৃণালকুঞ্জের ম্যানেজারের পরিচয়ে গেলেন। যাতে আবাসিকদের সঙ্গে থেকে তাদের মনের কথা ও রহস্য খুঁজে বার করা সহজসাধ্য হয়। তাঁর দুই শাগরেদ তারাপদ ও চন্দন, আসা-যাওয়ার মধ্যে রইলো যাতে বাইরে থেকে সাহায্য করতে পারে। কিকিরা হরিচন্দনবাবুর কাছ থেকে দীননাথ (পূর্বম্যানেজার) এর পালিয়ে যাওয়ার কারণ জিজ্ঞেস করে জানতে পারেন যে, প্রথম ঘটনা অর্থাৎ শ্রীকান্তবাবু মারা যাওয়ার ঘটনায় দীননাথ অতটা ভয় পায়নি, কিন্তু মুরলীবাবুর মৃত্যুর ঘটনার পর আরো বেশি ভয় পেয়ে যায়। এপ্রসঙ্গে হরিচন্দনবাবুর কথায় জানা যায়,

> "দীননাথ বলছিল, দু' দিনই -ঘটনা দুটো ঘটে যাওয়ার পর সে আমাদের মৃণালকুঞ্জর সামনের দিকের ফটকের বাইরে পিলারের পাশে একটা জিনিস দেখেছে। মাটির বড় ধুনুচি, ঘুঁটেপোড়া, একমুঠো হলুদ রং মেশানো চাল, মাটির ছোট্ট ধেবড়া পুতুল-এক-দেড় আঙুল লম্বা বড়জোর। সাপেরখোলস ইত্যাদি।"[৮]

এইসব দেখিয়ে যে অপরাধী বিভ্রান্ত করতে চাইছে তা কিকিরা বুঝতে পেরেছেন। তাই তিনি আবাসনের বাসিন্দাদের নাম নথীভুক্ত রেজিস্টার দেখে কে কবের থেকে এখানে আছেন তার একটা হিসেব কষে নেন। বর্তমান বাসিন্দাদের মধ্যে রয়েছেন, বলাইবাবু, সলিলবাবু এবং জলধরবাবু ও রজনীবাবু, প্রত্যেকের বয়েসই ষাটের উপরে। এঁনাদের মধ্যে রজনীবাবুকে দেখে চন্দন বলেছিল,

> "চেহারা দেখে মনে হচ্ছে ব্লাডসুগারের পেশেন্ট।"[৯]

ভদ্রলোক খুব একটা কথাবার্তা বলেন না, বয়েস হবে সাতষট্টি-আটষট্টি। তিনি সারাদিন গাছ-গাছালির যত্ন নিয়ে থাকেন। বলাইবাবুর বয়েস মোটামটি বাষট্টির কাছাকাছি হবে, এখনোও শক্তপোক্ত আছেন, সলিলবাবুও বাষট্টির কাছাকাছি বয়েসের। আর যে দুজন মারা গিয়েছেন তাঁরা হলেন শ্রীকান্তবাবু ও মুরলীবাবু, এঁরা একই ঘরের বাসিন্দা ছিলেন। আবার কেউ-কেউ ছেড়েও চলে গেছেন। পাকাপাকি থাকার মধ্যে বলাইবাবু ও রজনীবাবু রয়েছেন। আরেকজন আছেন জলধরবাবু, যার বছরখানেক হল, আসার, এঁনার চোখে যেনো সবসময় বিরক্তির ছাপ। কিকিরা সকলের সঙ্গে মিশে মনের কথা বার করার চেষ্টা করলেন, যদিও বলাইবাবু ও সলিলবাবু পুরো সত্যিকথা বললেন না। সেকথা বুঝতে পেরে কিকিরা চন্দন ও তারাপদর মাধ্যমে প্রকৃত সত্যি জানলেন। বলাইবাবু বলেছিলেন তিনি ঘটনার দিন যাত্রার আসরে ঘুমিয়ে গিয়েছিলেন, অথচ তিনি সেদিন আবাসনের কাছে কলকারখানায় রাত কাটান, পরে সে কথা কিকিরা জানতে পারেন। আবার সলিলবাবুও মেয়ের বাড়ি থেকে অসুস্থ ছেলেকে দেখতে গিয়েছিলেন।

এখবর কিকিরাকে দেয় তারাপদ, সে ছদ্মবেশ নিয়ে সলিলবাবুর জামাইয়ের দোকান থেকে খবর নিয়ে আসে। কিন্তু এই খবর জানার পর কিকিরার একটা খটকা লাগে। ঘটনাগুলো শুরু হয়েছে জলধরবাবুর আগমনের পর, এর আগে এমন ঘটনা ঘটেনি। এ সম্পর্কে কিকিরা হরিচন্দনবাবুকে বলেন,

> "জলধরই শুধুবছরখানেক। উনি আসার আগে কোনও খারাপ ঘটনাই ঘটেনি বাড়িটাতে। যা যা ঘটল সবই জলধরবাবু আসার পর।"[১০]

যদিও জলধরবাবুকে দেখলে মনে হয়, অত্যন্ত ধার্মিক মানুষ। প্রত্যেকদিন সন্ধ্যায় দুহাতে তালি বাজিয়ে দেবদেবীর কীর্তন করেন তিনি, পরনে কখনও ছালিবস্ত্র, গায়ে ফতুয়া। প্রতিদিন সকালে তুলসি পাতা খান, যাতে ঠান্ডায় কাবু করতে না পারে। তাঁর সঙ্গে আলাপ করে কিকিরা, জানতে পারেন যে জলধরবাবুর স্ত্রীকে খুন করা হয়েছিল, তিনি তখন আন্দামানে চাকরি করতেন। বর্তমানে আত্মীয় বলতে একমাত্র ছেলে রয়েছে, কিন্তু ছেলের সঙ্গে সম্পর্ক নেই। মৃণালকুঞ্জে ঘটে যাওয়া দুটি খুনের বিষয়ে কিকিরা জলধরবাবুর মত জানতে চাইলে তিনি বলেন যে তাঁর ভয় করেনা, কিন্তু অস্বস্তি হয়। জলধরবাবুই সমস্ত ঘটনার পেছনে রয়েছেন কীনা, সেটা জানার জন্য কিকিরা কিছুটা সময় চান। কারণ তখনও সন্দেহের আওতায় ছিলেন বলাইবাবু ও সলিলবাবু। তাঁদের আলাপের ছলে জেরা করে কিকিরা নিশ্চিত হন যে এই ঘটনার সঙ্গে তাঁদের যোগ নেই। জলধরবাবুকে কিকিরা প্রথম সন্দেহ করেন, গানের গলা শুনে, তাছাড়া তিনি কিকিরার কাছে বলেছিলেন বাঁশি বাজাতে পারেন। এরপর নতুন চুনকাম করা তুলসীমঞ্চ (যেটি জলধরবাবুর তৈরি করানো) এবং সেটির অবস্থিতি দোতালার বারান্দায় যেখানে রয়েছে মুরলীবাবু ও শ্রীকান্তবাবুর ঘর। এই দুটি ঘটনার যোগসূত্র ধরে, কিকিরা দুইয়ে-দুইয়ে চার করে ফেললেন। এরপর বলাইবাবুর সঙ্গে কথা বলার সময় বেরিয়ে এলো রহস্য। যেদিন বলাইবাবুরা যাত্রা দেখতে গিয়েছিলেন, সেদিন বিকেলেই দুটো চিঠি এসেছিল, যার মধ্যে একটি ছিল জলধরবাবুর নামে। সেই চিঠি খুলে পড়েছিলেন শ্রীকান্তবাবু। তাঁর থেকে বলাইবাবু জানতে পারেন, যে সেই চিঠিতে কেউ জলধরবাবুকে শাসিয়েছে,

> "অনেক ঘুরে আট -আটটি বছর অপেক্ষা করে শেষপর্যন্ত সে খুঁজে পেয়েছে প্রতারক জোচ্চোর জলধরকে।"[১১]

সেখানে আগামী আট নভেম্বরের উল্লেখ ছিল, সেদিনই এসে সব হিসেব করবে এবং আসার সংকেত হবে সাঁপুড়ের বাঁশি। চিঠির একপাশে ছিল একটি সাপের ছবি, হাতে আঁকা। এই সমস্ত কিছুর থেকে কিকিরা অনেকটা আভাস পান, রহস্যের। এরপর তিনি সত্য যাচাই করার জন্য এবং নিশ্চিত হওয়ার জন্য চন্দনদের দিয়ে কিছু জিনিষপত্র আনালেন, যেগুলোর মধ্যে ছিল বিদেশি ক্যাসেট প্লেয়ার, যার সাহায্যে তিনি সাপের বাঁশির সুর বাজিয়ে ফাঁদ পাতলেন। কারণ ওই চিঠির কথা যদি সত্য হয়, তবে সাপের বাঁশির সুর শুনে জলধরবাবু অবশ্যই ভয় পেয়ে বেরিয়ে আসবেন। শেষে দেখা যায় কিকিরার অনুমানই সত্য হল। প্রমাণ পাওয়ার পরের দিন সকালে কিকিরার কথায় হরিচন্দনবাবুর লোক তুলসীমঞ্চ ভাঙা শুরু করলে সেখানে গর্তের মধ্যে মোটা পলিথিনে জড়ানো একটি বাক্সের মতো দেখা যায়। সেটা দেখে জলধর বলেন ওটা তাঁর গুরুদেবের অস্থি, তাই সেটাতে হাত দেওয়া যাবে না, তখন হরিবাবু বলেন, যদি সত্যি গুরুদেবের অস্থি হয়, তাহলে তিনি তুলসীমঞ্চ আবার নতুন করে বানিয়ে দেবেন। তারপর দেখা যায় সেই পলিথিন থেকে বার হয় একটি সোনার সাপের মূর্তি, যার চোখে দুটি লাল চুনি বসানো। সাপটির মাথার উপর একটি প্রদীপ রয়েছে, সেই প্রদীপের মুখে একটি হীরের টুকুরোও ছিল। তখন কিকিরা জলধরবাবুকে জেরা করলে তিনি সব স্বীকার করেন। আন্দামানের ভবানীশঙ্কর নামে একজনের কাছ থেকে তিনি মূর্তিটি চুরি করেছিলেন। তিনি স্বীকার করেন যে,"আমি লোভে পড়ে এই কাজ করেছি।"[১২] আন্দামান থেকে পালিয়ে এসে নিজের পদবি বদলে এফিডেভিট করে বিশ্বাস থেকে হালদার করেন। শ্রীকান্তবাবুকে কেন মারলেন, জিজ্ঞেস করায় জলধরবাবু জানান যে তিনি (শ্রীকান্তবাবু) তাঁকে সন্দেহ করতেন, সেজন্য তিনি মারতে বাধ্য হন। আর মুরলীবাবুকে বাঁচিয়ে রাখলে একজন সাক্ষী থেকে যেতো, তাই মুরলীবাবুকেও শেষ করে দেন। অত্যন্ত সাদামাটা ও ঠাকুরভক্ত ব্যক্তি জলধরবাবু ঠান্ডা মাথায় দুই-দুইটি খুন করেন এবং সেটিকে চাপা দেওয়ার জন্য ভৌতিককান্ড কান্ডকারখানার আশ্রয় নেন।

পরিশেষে বলা যায়, সমাজ যতদিন আছে, ততদিন অসামাজিক বিষয়গুলোও থাকবে। আর সেজন্যই রহস্য কাহিনির মাধ্যমে আনন্দ অনুভব করতে পারছেন পাঠককুল। এ সম্পর্কে প্রসেনজিৎ দাশগুপ্তের একটি উক্তি উল্লেখ করা যায়,

> "এক শিক্ষকমশাই বলেছিলেন, কর্ম থাকলে অপকর্মও থাকবে।"[১৩]

ভিলেনেরও অপরাধ ঘটায় বলেই গোয়েন্দারা তার রহস্য উদঘাটন করতে পারেন এবং জনপ্রিয়তা লাভ করেন। তাই রহস্য কাহিনিতে ভিলেনেরও যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে।

তথ্যসূত্র:

১) দাশগুপ্ত, প্রসেনজিৎ। রহস্য গল্পের নায়কেরা। আত্মজা পাবলিশিং, প্রথম সংস্করণ, ২০১৯, কলকাতা- ৫৭, পৃ: ১।
২) তদেব, পৃ: ১৪২।
৩) তদেব, পৃ: ১৪১।
৪) তদেব, পৃ: ১৪৫।
৫) তদেব, পৃ: ১৪৯।
৬) কর, বিমল। কিকিরাসমগ্র (২য় খন্ড)। আনন্দ পাবলিশার্স, প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি, ২০০২, পঞ্চম মূদ্রণ, মে ২০২৫, কলকাতা ৭০০০১৪, পৃ: ১২।
৭) তদেব, পৃ: ৩০।
৮) তদেব, পৃ: ১০৬।
৯) তদেব, পৃ: ১০৯।
১০) তদেব,পৃ: ১৩৬।
১১) তদেব, পৃ: ১৫১।
১২) তদেব, পৃ: ১৫৭।
১৩) দাশগুপ্ত, প্রসেনজিৎ। রহস্য গল্পের নায়কেরা। আত্মজা পাবলিশিং, প্রথম সংস্করণ, ২০১৯, কলকাতা- ৫৭, পৃ: ১৫৩।